ভাবার্থ

কোনো প্রবন্ধ বা গদ্যরচনার তাৎপর্যধর্মী অংশবিশেষ কিংবা কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ ছোটো কবিতা বা দীর্ঘ কবিতার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ খণ্ডাংশের অন্তর্নিহিত কেন্দ্রীয় ভাববস্তুকে সংক্ষেপে বিবৃত করাকে ভাবার্থ বলা যেতে পারে। ইংরেজিতে 'Substance' বলতে যা বোঝায় বাংলাভাষায় তারই যথার্থ প্রতিশব্দ হল ভাবার্থ। ভাবার্থকে 'ভাবসত্য', 'মর্মসত্য', 'মর্মার্থ', 'তাৎপর্যার্থ', ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা যায়।

ভাবার্থ লিখনের ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন, যেমন—

- উদ্ধৃত অংশের রচয়িতার নাম জানা থাকলেও উল্লেখ করা উচিত নয়।
- ভাবার্থটি একটি অনুচ্ছেদে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- উদ্ধৃত অংশে উক্তি-প্রত্যুক্তি থাকলে ভাবার্থে তা নিজের ভাষায় লিখতে হবে।
- মূল রচনা উত্তম কিংবা মধ্যম পুরুষে লেখা হলে ভাবার্থে তাকে প্রথম পুরুষে লিখতে হবে। আসল কথা, মূল অংশ যে পুরুষেই লেখা হোক-না কেন ভাবার্থে প্রথম পুরুষের ব্যবহারই শ্রেয়।
- মূল রচনায় উপমা-অলংকার-প্রসঙ্গ-দৃষ্টান্ত-রূপক যা-ই থাকুক-না কেন ভাবার্থে সেগুলি বর্জন করতে হবে। শুধুমাত্র সে সবের অন্তর্নিহিত ভাবটুকু গ্রহণ করে নিজের ভাষায় তা পরিস্ফুট করতে হবে। অর্থাৎ উপমা-অলংকারাদির প্রয়োগের কারণ অনুধাবন করে তাদের তাৎপর্য আবিষ্কার করতে পারলেই ভাবার্থের মর্মমূলে পৌঁছোনো যাবে।
- উদ্ধৃতাংশ অর্থাৎ মূল রচনার মধ্যে যদি কোনো উদ্ধৃতি থাকে তা হলে ভাবার্থে সেই উদ্ধৃতিচিহ্ন তুলে দিয়ে তার মূল ভাবটিকে উপস্থিত করতে হবে।
- ভাবার্থ যেহেতু মূল বিষয়ের সারমর্ম, তাই মূল রচনায় যে বাহুল্য আছে, যথাসম্ভব তা পরিহার করা উচিত।
- ভাবার্থ লিখনের সময়ে মূল ভাবকে সুপরিস্ফুট করতে গিয়ে ভিন্নতর কোনো প্রসঙ্গের অবতারণা করা চলবে না। ভাবার্থকারকে এ বিষয়ে সংযত হতে হবে। মনে রাখতে হবে, ভাবার্থে মূলরচনা-বহির্ভূত কোনো বিষয়ের উপস্থাপন একান্তই অনুচিত।

১ "পরের মুখে শেখা বুলি পাখির মতো কেন বলিস ?
পরের ভঙ্গি নকল করে নটের মতো কেন চলিস ?
তোর নিজস্ব সর্বাঙ্গে তোর দিলেন বিধাতা আপন হাতে;
মুছে যেটুকু বাজে হবি, গৌরব কি বাড়ে তাতে ?
আপনারে যে ভেঙেচুরে গড়তে চায় পরের ছাঁচে,
অলীক, ফাঁকি, মেকি সে-জন, নামটা তার ক'দিন বাঁচে ?
পরের চুরি ছেড়ে দিয়ে আপন মাঝে ডুব যারে।
খাঁটি ধন যা সেথায় পাবি; আর কোথাও পাবি নারে।"

অনুকরণের দ্বারা কখনো খুব বড়ো হওয়া যায় না। বড়ো হতে হলে নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিধাতা প্রদত্ত শক্তিকে নিষ্ঠা ও অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। যাদের স্বভাবে ফাঁকি আছে এবং রয়েছে আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তির একান্ত অভাব তারাই অনুকরণ করে। সাফল্যের জন্য প্রয়োজন হয় যোগ্যতার। নকলনবিশ না হয়ে আপন সত্তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠলে মানুষ পরম সম্মান লাভ করবে।

২ "তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব, আঘাত খেয়ে অটল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে তব বাজবে জয়ডঙ্ক
দেব সকল শক্তি, লব অভয় তব শঙ্খ।"

ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তে সামগ্রিক কল্যাণের জন্য আত্মশক্তির জাগরণ ঘটানোর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবজীবনের সার্থকতা। সমস্ত রকম প্রতিকূলতা ও আঘাত সহ্য করেও পূর্ণ শক্তিতে জাগ্রত হয়ে অকল্যাণ ও অশুভের সঙ্গে সংগ্রামে রত হলেই মানবিক মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা হবে।

৩ জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাত-জালিয়াৎ খেলছে জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে ? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া।
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতে জাতির জান,
তাইত বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে একশ'খান।।
এখন দেখিস্ ভারত-জোড়া
পচে আছিস বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কাহুয়া।

স্বার্থান্বেষী, রক্ষণশীল মানুষদের কূটকৌশলে বিভ্রান্ত সমাজ জাতিভেদ, বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে মানবতার অবমাননা করে চলেছে। এই ভেদনীতি, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতিকে প্রকৃত ধর্মাচরণ মনে করে আমরা অখণ্ড মানবজাতিকে বহুধাবিভক্ত করছি। মানবিক মূল্যবোধ, উদার চেতনা হারিয়ে মানুষ আজ মৃতপ্রায়। শ্মশানতুল্য সমাজে আজ শুধু রয়েছে ধূর্ত শেয়ালের মতো মানবতা-বিরোধী কুচক্রী নীচ রক্ষণশীলদের দাপট।

৪ দরিদ্র বলিয়া তোরে বেশি ভালোবাসি
হে ধরিত্রী, স্নেহ তোর বেশি ভালো লাগে
বেদনাকাতর মুখে সকরুণ হাসি,
দেখে মোর মর্মমাঝে বড়ো ব্যথা জাগে।...
আজি শেষ নাহি হল দিবাস নিশীথে-
স্বর্গ নাই রচেছিস্ স্বর্গের আভাস।
তাই তোর মুখখানি বিষাদ কোমল।
সকল সৌন্দার্য তোর ভরা অশ্রুজল।

এই বিশ্বসংসারে ধনী-দরিদ্র উভয় শ্রেণির মানুষই আছে। ধরিত্রী

মাতা দরিদ্র সন্তানকেও কম ভালোবাসা দেন না। কোনো-কোনো মানুষের দারিদ্র্যই তাকে মহান করে তোলে। ধরিত্রী এই দরিদ্র মানুষের বেদনাকাতর মুখ দেখে তার প্রতি অন্তরের ভালোবাসা জানায়। তার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয়। সেই সৌন্দর্য রাজৈশ্বর্যের চেয়ে কম নয়।

৫ শঙ্খকে সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেও সে সমুদ্রের গান ভুলিতে পারে না। উহা কানের কাছে ধরো, উহা হইতে অবিশ্রাম সমুদ্রের ধ্বনি শুনিতে পাইবে। পৃথিবীর সৌন্দর্যের মর্মস্থান তেমনি স্বর্গের গান বাজিতে থাকে। কেবল বধির তাহা শুনিতে পায় না। পৃথিবীর পাখির গান পাখির গানের অতীত আরেকটি গান শোনা যায়, প্রভাতের আলোক প্রভাতকে অতিক্রম করিয়া আর একটি আলোক দেখিতে পায়। সুন্দর কবিতার কবিতায় দেখা অতীত আরেকটি সৌন্দর্য মহাদেশের তীরভূমি চোখের সম্মুখে রেখার মতো পড়ে।

▶▶ ঐতিহ্যের প্রবহমানতা জীবনের ধর্ম। স্থান-কাল-পাত্রের নিরিখে সৃষ্টি কখনই ঐতিহ্যহীন হয়ে পড়ে না। সমুদ্রের ধ্বনি, পাখির গান, সুন্দর কবিতা চিরসুন্দরের বাহক হয়ে পৃথিবীকে আরও সৌন্দর্যময় করে তোলে।

৬ লেখাপড়া একটা খুব বড়ো মানসিক দুঃসাহসিকতা। যারা সারাদিন ঘরে বসে পড়ে, তাদের ঘরটার চারধারের দেওয়ালে বন্ধ থাকলেও মন উড়ে যায় অনেক অনেক দূরে—অসীম শূন্য পার হয়ে কোটি কোটি অজ্ঞাত নক্ষত্রলোকের দেশে দেশে। সময়ের কুয়াশা ভেদ করে তাদের মন ফিরে যায় একেবারে পৃথিবীর সে-যুগে যখন মানুষ সৃষ্টি আরম্ভ হয়নি, জলাজঙ্গলে অজ্ঞাত ভীষণদর্শন অধুনালুপ্ত অতিকায় প্রাণীদের সাজা সাজা অজ্ঞাত গাছপালায় ভরা আদিমযুগের জঙ্গলে। এই জগতে সবচেয়ে বড়ো আনন্দ হচ্ছে অজানার আনন্দ—জানা জিনিসে কোনো সুখ নেই।

▶▶ শিক্ষা মানুষের মনকে মুক্ত ও সুদূরপ্রসারী করে। একমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা সম্ভব। লেখাপড়ার দ্বারা বিশ্বসৃষ্টির রহস্য উন্মোচিত হয়। যার দ্বারা মানবমন স্থান ও কালের সীমানা পেরিয়ে অজানাকে জানার পরম আনন্দ লাভ করতে পারে।

৭ শ্যামল সুন্দর সৌম্য, হে অরণ্যভূমি,
মানবের পুরাতন বাসগৃহ তুমি।
নিশ্চল নির্জীব নহ সৌধের মতন—
তোমার মুখশ্রীখানি নিত্যই নূতন
প্রাণে প্রেমে ভাবে অর্থে সজীব সচল।
তুমি দাও ছায়াখানি, দাও স্বাধীনতা;
নিশিদিন মর্মরিয়া কহ কত কথা
অজানা ভাষার মন্ত্র; বিচিত্র সংগীতে
গাও জাগরণ গাথা; গভীর নিশীথে
পাতি দাও নিস্তব্ধতা অঞ্চলের মতো
জননী-বক্ষের; বিচিত্র হিল্লোলে কত
খেলা কর শিশুসনে; বৃদ্ধের সহিত
কহ সনাতন বাণী বচন-অতীত।

▶▶ মানুষের আদিতম বাসস্থান ছিল অরণ্যভূমি। কিন্তু সভ্যতার বিবর্তনে আমরা বর্তমানে সেই উন্মুক্ত সুখগৃহ থেকে নির্বাসিত হয়ে মানুষেরই গড়া নিষ্প্রাণ জীবনহীন শহরের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দিজীবন অতিবাহিত করছি। একদা অরণ্য, মায়ের মতো সুনিবিড় স্নেহে মানবকুলকে প্রতিপালন করত। সে জীবন ছিল মুক্ত-বাধাবন্ধনহীন। তাই লাবণ্যময়ী মাতৃরূপিণী, কল্যাণদাত্রী অরণ্যের কাছে আমরা ঋণী।

৮ হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুটদণ্ড সিংহাসন ভূমি,
ধরিতে দরিদ্রবেশ; শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভুলি জয়-পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।

▶▶ আত্মিক চিন্তনের মূল ভিত্তিভূমি মহান এই ভারতবর্ষ ভোগের কথা না-বলে ত্যাগের কথাই বড়ো করে বলেছে। সে নৃপতিকে যেমন উপদেশ দিয়েছে দরিদ্র হতে, ঠিক তেমনি প্রকৃত বীরকে উপদেশ দিয়েছে শত্রুকে ক্ষমা করতে। লোভহীন চিত্তে কর্মীকে কর্ম করার কথাও বলেছে। গৃহী যেন তার প্রতিবেশীকে বন্ধুরূপেই জ্ঞান করে—ভারতবর্ষ সেই শিক্ষাই দেয়।

৯ জলহারা মেঘখানি বরষার শেষে
পড়ে আছে গগনের একাকোণ ঘেঁষে।
বর্ষাপূর্ণ সরোবর তারি দশা দেখে
সারাদিন ঝিকিঝিকি হাসে থেকে থেকে।
কহে, ওটা লক্ষ্মীছাড়া, চাল-চুলাহীন,
নিজেরে নিঃশেষ করি কোথায় বিলীন।
আমি দেখো চিরকাল থাকি জলভরা,
সারবান, সুগম্ভীর, নাই নড়াচড়া।
মেঘ কহে, ওহে বাপু, কোরো না গরব,
তোমার পূর্ণতা সে তো আমারি গৌরব।

▶▶ বর্ষার মেঘ তার অকৃপণ জলবর্ষণে সরোবরকে পূর্ণতা দেয়। নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে সে অপরকে সমৃদ্ধ করে। এটিই জীবনসত্য। কিন্তু জগৎসংসারে কিছু মহৎ ব্যক্তির নিঃস্বার্থ দানে যারা উপকৃত হয়, তারা মনের ক্ষুদ্র সংকীর্ণতায় সেই দানকে অবহেলা ভরে অস্বীকার করে আপন গৌরবে মহৎ হতে চায়। কিন্তু এই অকৃতজ্ঞতা কখনোই নিঃস্বার্থ পরোপকারী ব্যক্তিদের সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না।

১০ তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে, প্রত্যেকের 'পরে
দিয়েছ শাসনভার, হে রাজাধিরাজ।
সে গুরু সম্মান তব সে দুরূহ কাজ
নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য করি
সবিনয়ে। তব কার্যে যেন নাহি ডরি
কভু কারে।
ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খর খড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

▶▶ বিশ্বস্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। সে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব। ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছে বিচারের শক্তি। একজন শ্রেষ্ঠ বিচারকের চরিত্রে একদিকে যেমন থাকবে বজ্রকঠোর অনমনীয়তা, অন্যদিকে তেমনি

থাকবে কুসুমকোমল স্নেহপ্রবণতা। ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে তাঁর বিবেকের দংশন ঘটবে না। ক্ষমা যেখানে দুর্বলতার নামান্তর সেখানে মানুষকে কঠিন ও অনমনীয় হতে হবে। সত্যভাষণে প্রদীপ্ত হয়ে তাকে নিরপেক্ষ বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত হতে হবে। কারণ, যে অন্যায় করে এবং যে অন্যায় দেখে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে — তারা উভয়েই বিশ্বপিতার ঘৃণার পাত্র।

১১ পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে।
দেশদেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালো ছেলে করে।
প্রাণ দিয়ে দুঃখ স'য়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ-সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ক'রে।
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ কর নি।।

কর্মই ধর্ম, তাই জীবনে প্রকৃত মানুষ হতে গেলে সমস্ত কুসংস্কারের বেড়াজাল অতিক্রম করে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। নিষেধের বাতাবরণ উপেক্ষা করে ভালোমন্দ বিচার না করে অগ্রসর হতে হবে সামনের দিকে। সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে। বাঙালি বা ভারতীয় নয়, বিশ্ব নাগরিকই আমাদের পরম কাঙ্ক্ষিত। স্বার্থ পরিত্যাগ করে বিশ্বের আহ্বানে নিজেকে সঁপে দিয়ে ধন্য হওয়াই প্রকৃত মানবিকতার সংজ্ঞা।

১২ চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়—
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করে নি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।।

ভারতে এমন এক আদর্শ রাষ্ট্রীয় বোধ জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন যেখানে মানুষ সমুচ্চ মহিমায় ও মুক্ত প্রজ্ঞায় বৃহৎকে স্পর্শ করবে। যেখানে মানুষ আচারসর্বস্বতার সংকীর্ণ শৃঙ্খল হতে মুক্ত, যেখানে মানুষ দীপ্ত পৌরুষের মহিমায় উন্নীত, যেখানে সে সর্বকর্ম সাধনার আপোশহীন অগ্রপথিক। বিশ্বপিতা যেন ভারতবাসীর সমস্ত ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা, অসম্পূর্ণতার মূলে চরম আঘাত করেন; এবং এক অখণ্ড পরিপূর্ণতার স্বর্গময় পুণ্যভূমিতে মানুষকে পৌঁছে দেন।

১৩ দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছ, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ— দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কাজ হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোনো মঙ্গল নাই।

দেশের মঙ্গল নিয়ে যারা চিন্তিত তাদের বোঝা উচিত, এদেশের বেশির ভাগ মানুষ কৃষিজীবী। সংখ্যালঘু কিছু মানুষের মঙ্গলসাধন নয়; কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষের সামগ্রিক মঙ্গলের মধ্যেই নিহিত রয়েছে দেশের প্রকৃত মঙ্গল। কৃষিজীবী মানুষদের দুর্দশায় রেখে দেশের মঙ্গলের কথা ভাবা অর্থহীন।

১৪ বর্তমান সভ্যতায় দেখি, এক জায়গায় একদল মানুষ অন্ন উৎপাদনের চেষ্টায় নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করছে আর এক জায়গায় আরেক দল মানুষ স্বতন্ত্র থেকে সেই অন্নে প্রাণধারণ করে চলেছে। চাঁদের একপিঠে যেমন অন্ধকার, অন্যপিঠে আলো; এও সেইরকম। একদিকে দৈন্য মানুষকে পশু করে রেখেছে..........অন্যদিকে ধনের সন্ধান, ধনের অভিমান, ভোগবিলাস সাধনের প্রয়াসে মানুষ উন্মত্ত। অন্নের উৎপাদন হয় পল্লীতে, আর অর্থের সংগ্রহ চলে নগরে। অর্থ উপার্জনের সুযোগ এবং উপকরণ যেখানেই কেন্দ্রীভূত স্বভাবত আরাম আরোগ্য, আমোদ ও শিক্ষার ব্যবস্থা সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অল্পসংখ্যক লোককে ঐশ্বর্যের আশ্রয় দান করে।

আধুনিক সভ্যতা যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ, তেমনি তা বৈষম্যমূলকও বটে। তাই দেখা যায়, এখানে অন্ন উৎপাদকই নিরন্ন রয়ে গেছে। পল্লির বহুলসংখ্যক মানুষকে দৈন্যের পাথারে ডুবিয়ে মুষ্টিমেয় নগরবাসী শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিলাসের যাবতীয় উপকরণ করায়ত্ত করে রেখেছে।

১৫ আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোকমাত্রেই স্ব-শিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যাদাতার অভাব নেই, এমনকি ওস্তাদেও দাতা কর্ণেরও অভাব নেই। এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিন্ত থাকি এই বিশ্বাসে যে, সেখান থেকে তারা একটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে, যার সুদে বাকী জীবনটা আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। মনোরাজ্যেও দান গ্রহণসাপেক্ষ। অথচ আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহীতার কথাটা একেবারে ভুলে যাই। এ সত্য ভুলে না গেলে আমরা বুঝতুম যে, শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয় — ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার কৌতূহলকে উদ্রেক করতে পারেন; এর বেশি আর কিছু পারেন না। যিনি যথার্থ গুরু তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্‌বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত এবং ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে সে নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের প্রয়োজনমত বিদ্যা নিজে অর্জন করে। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজেকে করতে হয়। গুরু উত্তরসাধক মাত্র।

শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবক—এই তিনের মধ্যে শিক্ষার্থীই মূল। অভিভাবক এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীকে জ্ঞান অর্জনের উপযুক্ত ক্ষেত্রে পৌঁছে দিতে পারেন মাত্র। কিন্তু শিক্ষার্থী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে সমৃদ্ধ করে। শিক্ষার আয়োজক হিসেবে শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষক শিক্ষার পথ, মনোরাজ্যের

ঐশ্বর্যের সন্ধান ও কৌতূহল জাগাতে পারেন মাত্র কিন্তু সাধনা শিক্ষার্থীকে নিজেকেই করতে হবে।

১৬ দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নবসভ্যতা। হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবার-ধান্যের মুষ্টি, বল্কলবসন,
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি। পাষাণপিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদ রাজভোগ নব,
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,
পরানে স্পর্শিতে চাই ছিঁড়িয়া বন্ধন,
অনন্ত এ জগতের হৃদয়স্পন্দন।

▶▶ স্নিগ্ধ, শীতল অরণ্যের শ্যামলিমাই ভারতাত্মার উৎসভূমি। কিন্তু সভ্যতার বিবর্তনে ধীরে ধীরে নগর সৃষ্টি হচ্ছে। নগরের কেন্দ্রে বিত্ত, প্রতিপত্তি, স্বাচ্ছন্দ্য উঁকি দিচ্ছে। চারিদিকে সৌধ-অট্টালিকা, বিচিত্র বিপণি, শিল্প ক্রমশ বিলীন করে দিচ্ছে গ্রামীণ মানুষ ও শহরের মানুষের হৃদয়ের বন্ধনকে। চারিদিকের ইঁট-কাঠ-পাথর-লৌহের পিঞ্জর মানুষের হৃদয়েও বাসা বাঁধছে। শহরের মোহ গ্রামের মানুষের সহজসরল জীবনযাত্রা, গোপালন, কৃষিকাজকে অবহেলা করছে। লৌহ-কাষ্ঠ শুধু পরিবেশের ভারসাম্যই নষ্ট করছে তা নয়, পরিবেশদূষণ আমাদেরকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। নগরসভ্যতা মানুষকে তাৎক্ষণিক আনন্দ দিচ্ছে হয়তো কিন্তু গ্রাস করছে পরিবেশকে।

১৭ এ দুর্ভাগা দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণভার,
এই চিরপেষণযন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্যমর্যাদাগর্ব চিরপরিহার—
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো। মঙ্গল-প্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক-মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে।।

▶▶ এই দুর্ভাগা দেশে মনুষ্যত্বের দুর্বিষহ অবমাননা ঘটে চলেছে, যার মূলে রয়েছে মানবজীবনের কোনো-না-কোনো ভীতি। লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় সমগ্র জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডকে যেন বিচূর্ণ করে দিয়েছে। এরই ফলস্বরূপ পরাধীনতার কলঙ্কে কালিমালিপ্ত হয়ে পড়েছে দেশীয় জীবন। প্রতিটি মুহূর্তে মানবাত্মা যেন নির্যাতনের নির্মম পেষণে পীড়িত। পরম মঙ্গলময় বিধাতার কাছে তাই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই যে, মানবজীবনে শক্তি সঞ্চারিত করে তিনি যেন এই দুর্বল সন্ত্রস্ত দেশবাসীকে দাসত্বের পীড়ন থেকে মুক্ত হবার সৎসাহস প্রদান করেন। উদার-উন্মুক্ত স্বাধীন আকাশে উজ্জীবিত হোক মানবজীবন, পরম করুণাময়ের অপার কৃপায় মানুষ লাভ করুক মানবের পূর্ণ মর্যাদা।

১৮ মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য করে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রুময়,
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয়।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরই মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।
হাসিমুখে নিয়ো ফুল, তার পরে হায়
ফেলে দিও ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।।

▶▶ এই বিশ্বপৃথিবীতে মানবজীবন সীমিত পরিধির মধ্যে সীমায়িত। সেইজন্য পৃথিবীতে মানুষ যতদিন থাকে সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দিতে চায়। এই পৃথিবী মানুষের কাছে খুবই মোহময়। প্রেম, প্রীতি, মমতা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসার আকর্ষণও কোনো অংশে কম নয়। দুঃখ, কান্না, মৃত্যু, অন্ধকারকে হাসি মুখে মেনে নেওয়া উচিত, কারণ এরা আছে বলেই জীবন বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় হয়ে ওঠে।

১৯ দেবতামন্দিরমাঝে ভকত প্রবীণ
জপিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন।
হেনকালে সন্ধ্যাবেলা ধূলিমাখা দেহে
বস্ত্রহীন জীর্ণ দীন পশিল সে গেহে।
কহিল কাতরকণ্ঠে, "গৃহ মোর নাহি,
এক পাশে দয়া করে দেহো মোরে ঠাঁই।"
সসংকোচে ভক্তবর কহিলেন তারে,
"আরে আরে অপবিত্র, দূর হয়ে যা রে।"
সে কহিল, "চলিলাম"—চক্ষের নিমেষে
ভিখারী ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে, "প্রভু, মোরে কি ছল ছলিলে।"
দেবতা কহিল, "মোরে দূর করি দিলে।
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।"

▶▶ চার দেয়ালের বদ্ধ গণ্ডির মধ্যে ভক্ত দেব-আরাধনায় রত। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট জগতের মাঝে চির বিরাজমান। কারণ সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টার অস্তিত্ব। তাকে মন্দিরের সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ করে রাখা যায় না। সব ঠাঁই তাঁর ঘর। তিনি দীন-দরিদ্ররূপে জগতের মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ান প্রেমের ও সেবার ভিক্ষা চেয়ে। তাই দীন দরিদ্রকে গৃহ দিলে তাঁকেই গৃহ দান করা হয়।

২০ কে বলে তোমারে বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি ?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমার পিছনে।
তুমি আছ গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।
শিশুজ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে,

ঘুচাইছ রাত্রিদিন সর্ব ক্লেদ গ্লানি।
ঘৃণার নাহিক কিছু স্নেহের মানব,
হে বন্ধু, তুমিই একা জেনেছ সে বাণী।
নির্বিচারে আবর্জনা বহ অহর্নিশ।
নির্বিকার সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল।
নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্বিষ;
আর তুমি ? — তুমি তারে করেছ নির্মল।
এসো বন্ধু, এসো বীর, শক্তি দাও চিতে—
কল্যাণের কর্ম করি লাঞ্ছনা সহিতে।

▸▸ সাফাইকর্মী অর্থাৎ মেথরের কাজ কখনও খারাপ নয়, কারণ সে তো মানুষের সেবা করে। ঘৃণাভরে সে কোনো কাজ করে না বলেই পৃথিবী আজ মালিন্যমুক্ত ও মনুষ্যবাসের উপযোগী হয়ে রয়েছে। তাকে 'সমাজবন্ধু' নামেই অভিহিত করা উচিত। গঙ্গাজলের মতোই তার পবিত্রতা, নীলকণ্ঠের মতো সে কণ্ঠে বিষ ধারণ করে। তার ওই কল্যাণব্রতে আমাদেরও অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত।

২১ নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপ
যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায়
বারংবার কেঁপে,
যারা অন্যমনা, তারা শোনো—
আপনারে ভুলো না কখনো।
মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা
জ্বালে অনির্বাণ
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদের নিত্য পরিচয়,
তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।
তাদের সম্মান মানো নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।

▸▸ দুঃখের অগ্নিবাণে চিত্তচঞ্চলতার পরিবর্তে জীবনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে হয়। মন স্থির করে, আত্মবিস্মৃত না হয়ে সংকীর্ণতার গণ্ডি অতিক্রম করে মৃত্যুঞ্জয়ীদের আদর্শের সঙ্গে হতে হবে পরিচিত। অনির্বাণ আলোকে আলোকিত যাঁরা, তাঁদের সুমহান আদর্শের সম্মান রক্ষা করতে হবে। চিরস্মরণীয়দের অপমান-লাঞ্ছনায় আমরা যেন হই অপমানিত-লাঞ্ছিত; তাঁদের সম্মানে আমরা হই সম্মানিত — এই বোধ জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন।

২২ জীবনে যত পূজা হল না সারা
জানি হে, জানি তাও হয় নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা,
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।।
জীবনে আজো যাহা রয়েছে পিছে
জানি হে, জানি তাও হয় নি মিছে।
আমার অনাগত আমার অনাহত
তোমার বীণাতারে বাজিছে তারা —
জানি হে, জানি তাও হয় নি হারা।।

▸▸ জীবনের সকল আন্তরিক প্রচেষ্টা পূর্ণতা পায়। বাগানের না ফোটা ফুল, মরুপথে শুষ্ক হয়ে যাওয়া নদী এ সবের উপস্থিতি যেমন সত্য, তেমনই সত্য সবার পিছনে পড়ে থাকা মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টা, যার দ্বারা তারা একদিন-না-একদিন পূর্ণতাকে স্পর্শ করতে পারবে।

২৩ জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ
আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ।
মাটিতে লালিত, ভীরু, শুধু আজ আকাশের ডাকে
মেলেছি সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।
যদিও নগণ্য আমি তুচ্ছ বটবৃক্ষের সমাজে
তবু ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মর ধ্বনি বাজে।
আজ শুধু অঙ্কুরিত, জানি কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা
উদ্দাম হাওয়ার তালে তালে নেড়ে যাবে মাথা।
তারপর দৃপ্ত শাখা মেলে দেব সবার সম্মুখে।
ফোটাবো বিস্মিত ফুল প্রতিবেশী গাছেদের মুখে।
সংহত কঠিন ঝড়ে, দৃঢ়প্রাণ প্রত্যেক শিকড়,
শাখায় শাখায় বাধা, প্রত্যাহত জানি হবে ঝড়।
অঙ্কুরিত বন্ধু যত মাথা তুলে আমারই আহ্বানে
জানি তারা মুখরিত হবে নব অরণ্যের গানে।
আগামী বসন্তে জেনো মিশে যাবো বৃহত্তর দলে
জয়ধ্বনি কিশলয়ে, সম্বর্ধনা জানাবে সকলে।

▸▸ প্রত্যেক ক্ষুদ্র-তুচ্ছ প্রাণের মধ্যেই থাকে অনন্ত সম্ভাবনা। আত্মবিশ্বাস, অনুশীলন এবং ইচ্ছাশক্তির জোরে সত্যি সত্যি একদিন ছুঁয়ে ফেলা যায় স্বপ্নকে। যখন সমস্ত সম্ভাবনা নিয়ে সত্যিই ক্ষুদ্রপ্রাণ বড়ো হয়ে যায়, তখন সে তার সমস্ত কর্ম এবং জীবনবোধ দিয়ে আগামীর কাছে অনুসরণযোগ্য হয়ে উঠতে চায়। তাকে সামনে রেখেই গড়ে ওঠে ভবিষ্যৎপ্রজন্ম। সে তার উত্তরসূরীকে নতুন করে বড়ো হয়ে ওঠার পথ দেখায়।

২৪ চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন
ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি;
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে নর-কুল-ধন।)
সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি মায়ে এ তিন ভুবন;
সেইরূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে।
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
হে কাশি, কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান্।

▸▸ শিবের জটায় যেমন গঙ্গা তেমনি সংস্কৃতসাহিত্য-সরোবরে ব্যাসদেবের মহাভারত। সগর বংশের মুক্তির জন্য ভগীরথ কঠোর তপস্যায় গঙ্গাকে মর্ত্যে প্রবাহিত করেছিলেন। সেইরকমভাবেই বাংলা ভাষায় মহাভারতের কাব্যরসের সঞ্চার করেছেন কবিশ্রেষ্ঠ কাশীরাম দাস। সেই অমৃতময় ভারতকথায় তৃষ্ণার্ত বঙ্গভূমি পরিতৃপ্ত হয়েছে। তাই বাংলাদেশ তথা বাঙালি মহাভারত তথা কাশীরামের কাছে চিরঋণী।

২৫ কিসের তরে অশ্রু ঝরে কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।
রিক্ত যারা সর্বহারা সর্বজয়ী বিশ্বে তারা,
গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তারা ক্রীতদাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।।
আমরা সুখের স্ফীত বুকের ছায়ার তলে নাহি চরি।
আমরা দুখের বক্রমুখের চক্র দেখে ভয় না করি।

ভয় হোক যথাসাধ্য বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য,
ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে ভিন্ন করব নীলাকাশ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।।

▶ জীবনের পথে সফলতা মানুষের মনকে উজ্জীবিত করে, আনন্দে ভরিয়ে তোলে। পাশাপাশি জীবনের বিভিন্ন বাঁকে আসে ব্যর্থতা। ব্যর্থতায় মানুষ ভেঙে পড়ে, হতাশাগ্রস্ত হয়। ব্যর্থতার দায়ভার তারা অদৃষ্টের হাতে দিয়ে দেয়। ভাগ্য সুপ্রসন্ন না-হলেও জীবনের লক্ষ্যপূরণের মনোবল, সাহস-ই মানুষকে শেষপর্যন্ত জয়যুক্ত হতে সাহায্য করে। অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে, ভাগ্যদেবীর ক্রীতদাস না-হয়ে নিরাশার মাঝে আশার দ্যোতনা বহনকারীই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। শুধুমাত্র সুখের আশা নয়, দুঃখের দুরূহ পথে নিঃশঙ্ক চিত্তে এগিয়ে যাওয়ার দুর্জয়, অদম্য মনোবল আর সাহসের অপর নাম জীবন। সেই জীবনেরই কাণ্ডারি মানুষ।

২৬ আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে —
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'
সুন্দর হল সে।
তুমি বলবে, এত তত্ত্বকথা
এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব এ সত্য,
তাই এ কাব্য।
এ আমার অহংকার,
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহংকার-পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।

▶ এই বিশ্বসংসারে যা কিছু দৃষ্টিগ্রাহ্য বা ইন্দ্রিয়গোচর, তাকে মূল্যায়নের যোগ্যতা একমাত্র মানুষের। মানুষই তার উপলব্ধি ও বুদ্ধির কষ্টিপাথরে কোনো কিছুকে যাচাই করে তার মূল্যায়ন বা বিচার করে। প্রকৃতির রাজ্যেও অকৃপণ সৌন্দর্যের উপভোক্তা একমাত্র মানুষের মন। তার মন শেষাবধি যে বস্তু বা বিষয়ের সৌন্দর্য উপলব্ধি করে মুগ্ধ হয়, তখনই সেটির সৌন্দর্য স্বীকৃতিলাভ করে। চুনি-পান্নার বিভা, আকাশের অসীমতা বা পুষ্পের সৌন্দর্য আস্বাদনের ক্ষমতা কেবল মানুষেরই আছে বলে এ জগতে সব কিছুর গুণমান বিচারের ভার শুধুই মানুষের এবং এখানেই মানুষ তার নিজস্বতার অহংকারকে দাবি করতে পারে।

২৭ বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী —
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু।
কত না অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে —
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।

বিশাল এই পৃথিবীতে মানুষের পরিচয়ের ক্ষেত্র বড়ো সীমাবদ্ধ। তাই পৃথিবীর নানা ভৌগোলিক বৈচিত্র্য, মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি, রহস্যময় অরণ্য, পাহাড়, সমুদ্র, মরুভূমি এবং নানা মানুষের বিস্তৃত যে কীর্তিচিহ্ন, যা নিখিল বিশ্বে ছড়িয়ে আছে তার সঙ্গে ব্যক্তি-মানুষের সংযোগ বড়ো সংকীর্ণ অথচ মানুষ সবকিছু জানতে চায়, দেখতে চায়। তাই তাকে নির্ভর করতে হয় নানা ভ্রমণবৃত্তান্তের ওপর আর এইভাবেই মানুষ অন্যের অভিজ্ঞতা রূপ সম্পদে নিজের জ্ঞানের দীনতা দূর করে।

২৮ আমার ভারতবর্ষ
পঞ্চাশ কোটি নিরন্ন মানুষের
যারা সারাদিন রৌদ্রে খাটে, সারারাত ঘুমাতে পারে না
ক্ষুধার জ্বালায়, শীতে;
কত রাজা আসে যায় ইতিহাস, ঈর্ষা আর দ্বেষ
আকাশ বিষাক্ত করে
জল কালো করে, বাতাস ধোঁয়ার কুয়াশায়
ক্রমে অন্ধকার হয়
চারদিকে ষড়যন্ত্র চারদিকে লোভীর প্রলাপ
যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ আসে পরস্পরের মুখে চুমু খেতে খেতে
মাটি কাঁপে সাপের ছোবলে, মত্ত বাঘের থাবায়!
আমার ভারতবর্ষ চেনে না তাদের
মানে না তাদের পরোয়ানা,
তার সন্তানেরা ক্ষুধার জ্বালায়, শীতে চারদিকের প্রচণ্ড মারের
মধ্যে
আজও ঈশ্বরের শিশু, পরস্পরের সহোদর।

▶ ভারতবর্ষ শীতার্ত, ক্ষুধার্ত, নিরলস কর্মমুখর পঞ্চাশ কোটি মানুষের দেশ। রাজ্যলোলুপ রাজশক্তির শাসনে ভারতবর্ষ দ্বেষ-দ্বন্দ্বে, যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষে বারংবার জর্জরিত হয় বটে। কিন্তু এই কলুষিত-কুটিল আবর্তের মাঝেও দেবশিশুসম নিরন্ন প্রবল শীতে কাতর ভারতবাসী সহোদরের ন্যায় ভ্রাতৃত্বের দৃঢ় বন্ধনে পরস্পর আবদ্ধ।

২৯ পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান
তার বেশি করে না সে দান,
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান,
আমি গাই গান।
বাতাসের কারেছ স্বাধীন,
সহজে সে ভৃত্য তব বন্ধনবিহীন।
আমারে দিয়েছ যত বোঝা,
তাই নিয়ে চলি পথে কভু বাঁকা কভু সোজা।
একে একে ফেলে ভার মরণে-মরণে
নিয়ে যাই তোমার চরণে
একদিন রিক্ত হস্ত সেবায় স্বাধীন;
বন্ধন যা দিলে মোরে করি তারে মুক্তিতে বিলীন।

বিশ্ববিধাতা পাখির কণ্ঠে দিয়েছেন গান আর মানবকণ্ঠে দিয়েছেন স্বর। মানুষ সেই স্বরকে সুরে পরিণত করে গান গেয়ে থাকে। বাতাস বাধাবন্ধনহীন, তাই স্বাধীন। কিন্তু মানবজীবনে আছে চড়াই-উতরাই পথ, তাকে অতিক্রম করে সর্বত্যাগী মানুষ রিক্ত হস্তে ঈশ্বরসেবায় সর্ববন্ধন থেকে মুক্তির স্বাদ পায়।

৩০ লক্ষ্মীছাড়া হও যদি খেয়ে আর দিয়ে।
কিছুমাত্র সুখ নাই হেন লক্ষ্মী নিয়ে।।
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে।
নিজে খাও খেতে দাও সাধ্য অনুসারে।।
ইহা যদি কমলার মন নাহি সরে।
পেঁচা নিয়ে যান মাতা কৃপণের ঘরে।।

▶ মানুষের দুটি সত্তা —একটা হিসাবি অন্যটা বেহিসাবি। ব্যয়ের ক্ষেত্রে সবাই এক, কিন্তু অপব্যয়ের পথ আলাদা। নিজে বেহিসাবি

খেয়ে এবং অন্যদের মধ্যে যথেচ্ছ বিলিয়ে যদি তুমি নিঃস্ব হও, তাহলে লক্ষ্মীছাড়া সংসারে বিন্দুমাত্র সুখ-শান্তি থাকবে না। পরিবর্তে মিতব্যয়ী হয়ে চললে ও বন্ধুদের সঙ্গে সাধ্যমতো মিশলে লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা হয়ে উঠবে সংসার।

৩১ বসুমতী কেন তুমি এতই কৃপণা
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্যকণা।
দিতে যদি হয় দে মা, প্রসন্ন সহাস।
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস?
বিনা চাষে শস্য দিলে কী তাহাতে ক্ষতি?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি ক'ন বসুমতী—
আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে;
তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে।

▶▶ বিনা পরিশ্রমে প্রাপ্তির মধ্যে কোনো গৌরব নেই, কোনো আত্মতৃপ্তি নেই। এক অর্থে তা আত্ম-অবমাননা। প্রবল প্রয়াসের মধ্য দিয়ে নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে যে প্রাপ্তি, তাই সার্থক। দুরূহ কর্মসাধনার মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকৃত বিকাশ ঘটে। আত্মশক্তিতে বলীয়ান মানুষ স্বনির্ভর হয়ে ওঠে।

৩২ বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে—
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

▶▶ মানবজীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের নয়। শোক-তাপ-দুঃখ-বেদনা-ব্যর্থতা-হতাশার অভিজ্ঞতা জীবনযাপনের অনিবার্য শর্ত। কোনো সাহায্য, সান্ত্বনা, বিপদমুক্তির জন্য ভীরুর মতো আকুল প্রার্থনা মানুষের দুর্বলতাকেই প্রকাশ করে। বরং আত্মশক্তিতে আস্থাবান হয়ে সমস্ত সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে জয় করার মধ্যেই রয়েছে মানুষের মহিমাময়রূপ।

৩৩ বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির-মাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

▶▶ জাগতিক বহুবিধ মায়ামোহের বাঁধন ছিন্ন করে তবেই ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব—মোক্ষলাভের এই ধারণা ও সাধনা বহুপ্রচলিত ও বহুল পরিচিত। সুখ-দুঃখময় জীবনকে অস্বীকার করে বৈরাগ্য ও নিরাসক্তির চর্চা কিন্তু প্রকৃত অর্থে জীবন-বিমুখ। পার্থিব যত সম্পর্কবন্ধন তা মানুষের সঙ্গে হোক বা প্রকৃতির সঙ্গে— সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি। মাটির পাত্রের মতো ভঙ্গুর এই জীবনের নশ্বরতার মধ্যেই রয়েছে যে অমৃতের আস্বাদ, তাকে পেতে হবে বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শ-শ্রুতির মাধ্যমে। চারপাশের সবকিছুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের এই প্রক্রিয়ায় ঈশ্বরের অনুভব এনে দেবে আনন্দঘন মুক্তির বোধ।

৩৪ জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ,
আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ;
মাটিতে লালিত ভীরু, শুধু আজ আকাশের ডাকে
মেলেছি সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।
যদিও নগণ্য আমি, তুচ্ছ বটবৃক্ষের সমাজে
তবু ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মরধ্বনি বাজে,
বিদীর্ণ করেছি মাটি, দেখেছি আলোর আনাগোনা।
শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা।

▶▶ বিকশিত হওয়া জীবনের মূল ধর্ম। চেতনার জাগরণের প্রাথমিক স্তরে শুধুমাত্র টিকে থাকার প্রবৃত্তি প্রধান হয় বলে নিরাপত্তাহীনতার ভয়, সন্দেহের অনুভূতিগুলি হয়ে ওঠে প্রবল। তারই মধ্যে থাকে নিজের তুচ্ছতাকে ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করার স্বপ্ন। মাটির ভিতরে গাছের শিকড়ে যেমন অরণ্যের সম্ভাবনা তেমনি ব্যক্তিচেতনার প্রকৃত বিকাশে মানবসভ্যতার সামগ্রিক অগ্রগতিই প্রতিবিম্বিত হয়।

৩৫ অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি,
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

▶▶ আধুনিক সময় এক সংকটের মুখোমুখি। যারা মানবসমাজের কল্যাণমূলক পরিণাম কীসে হবে সে বিষয়ে জ্ঞানহীন তারাই সভ্যতার দিকনির্দেশক হয়ে উঠেছে। হৃদয়হীন মানুষদের পরামর্শেই চলছে জগৎ। সংবেদনশীল মানুষ যারা মানবিকতায়, মহান মূল্যবোধে, সত্য ও সৌন্দর্যে বিশ্বাস রাখেন এখনও— এই আধুনিক কাল তাদের পরিত্যাগ করেছে নির্মমভাবে।

৩৬ হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,
পদ-লালিত্য-ঝঙ্কার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো!
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা।
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়;
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝল্‌সানো রুটি।।

▶▶ কাব্যিক ভাবালুতায় জীবন আচ্ছন্ন না হয়ে মোহমুক্ত গদ্যময় বাস্তববোধে যদি চেতনার উন্মেষ ঘটে, তবে জীবনের যথার্থ রূপটি পরিস্ফুট হয়। রূঢ় ও রুক্ষ বাস্তবের আঘাতে চেতনা কল্পনার ফানুস ওড়ানো থেকে নিবৃত্ত হয়। ক্ষুধায় মানবাত্মা পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার সৌন্দর্যের অনুধ্যানেও অসমর্থ হয়।